কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

সকিনা-বিলাপ: পাণ্ডুলিপি পাঠ ও বাংলা লিখন রীতি

শহিদুল হাসান*

সার-সংক্ষেপ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় আরবি-ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় লেখা পুথির বেশ কিছু নমুনা রয়েছে। পুথিগুলি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে এই রীতির নমুনা। বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লেখার এই পদ্ধতি কখন থেকে শুরু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই প্রবণতা এক সময় সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে; কেবল পুথি রচনা নয় বরং পুথি অনুলিপির ক্ষেত্রেও এই লেখরীতির ব্যবহার দেখা যায়। কোন শ্রেণির অনুলিপিকার এই রীতিতে পুথি লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন? তাদের ভাষা দক্ষতা কেমন ছিল? কেননা এভাবে লেখার জন্য অনুলিপিকারকে অবশ্যই বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি ভাষায় দক্ষ হতে হতো। কোন সামাজিক পরিসরে এই রীতি জনপ্রিয় ছিল? বর্তমান গবেষণায় আরবি-ফারসি হরফে বাংলায় লেখা *সকিনা-বিলাপ* পাণ্ডুলিপিটির পরিচয়, পাঠোদ্ধার এবং কাহিনি-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে। এছাড়াও এই রীতিতে অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপিগুলির বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনরীতি বিশ্লেষণপূর্বক সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলা পুথির নানাদিক তুলে ধরা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহটি দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য শিল্প এবং চিন্তার ইতিহাসের আকরসূত্রের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও পুথি বিষয়ক গবেষণাকর্মে মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আহমদ শরীফ, মুহম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, রাজিয়া সুলতানা, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া এবং অন্যান্য গবেষকদের অবদান অনস্বীকার্য। এই পুথি ভাণ্ডার দেশের বাইরের গবেষকদের তালিকায় আছেন অসীম রায় (Roy, 1983), টনি স্টুয়ার্ট (Stewart, 2019), আয়েশা ইরানী (Irani, 2021), ডেভিড কাসুন (Cashin, 1995), থিবো দ্যুবে (d'Hubert, 2022) এবং আরো অনেকেই। এই পণ্ডিতবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিভাণ্ডার থেকে আকরসূত্র সংগ্রহ করে বাংলার সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি ও ভাষাবিষয়ক মৌলিক গবেষণা করেছেন। এই বিশাল ভাণ্ডারে আরবি-ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় লেখা পুথির বেশ কিছু নমুনা রয়েছে। পুথিগুলি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি হরফে বাংলা পুথির লেখার ধারণাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল? মধ্যপর্বের কোন সময়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামে এভাবে পুথি তৈরি করা হয়েছিল? বাংলাদেশের অন্য কোনো স্থানেও কি এরকম পদ্ধতিতে পুথি অনুলিপি করা হয়েছিল? এস এম লুৎফর রহমান প্রস্তাব করেছিলেন, মুসলিম আমলের শেষদিকে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন বাড়তে থাকে। কালক্রমে এই প্রবণতা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে (লুৎফর, ২০০৫: ২০৯)। কেবল পুথি অনুলিপি নয় বরং পুথি রচনার ক্ষেত্রেও এই লেখরীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন শ্রেণির অনুলিপিকার এই রীতিতে পুথি লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন? তাদের ভাষা দক্ষতা কেমন ছিল? কেননা এভাবে লেখার জন্য অনুলিপিকারকে অবশ্যই বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি ভাষায় দক্ষ হতে হতো। কোন সামাজিক

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিসরে এই রীতি জনপ্রিয় ছিল? কেন এভাবে বাংলা পুথি অনুলিপি করার দরকার হয়েছিল? বর্তমান গবেষণায় আরবি-ফারসি হরফে লেখা *সকিনা-বিলাপ* পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধার ও কাহিনি-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে।[১] এছাড়াও এই রীতিতে অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপি *ফাতেমার সুরতনামা*, *শরীয়তনামা* ও *নুরনামা*– যেগুলি পাঠকৃত, সম্পাদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত– বিশ্লেষণপূর্বক সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষায় লিখন-পঠন রীতির নানাদিক তুলে ধরা হবে। প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে *সকিনা-বিলাপ* পাণ্ডুলিপির পরিচয়; দ্বিতীয় অংশে পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধারকৃত কাহিনি-সংক্ষেপ উপস্থাপন[২] এবং শেষ অংশে এই ধরনের পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করার কৌশল ও উপস্থাপনভঙ্গি বিশ্লেষণ করে আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা পুথি অনুলিপির প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

সকিনা-বিলাপ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

আবদুল করিম এবং আহমদ শরীফ রচিত *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection* গ্রন্থে নথিভুক্ত ১২৪-১২৫ পাণ্ডুলিপির লেখক অজানা এবং শিরোনাম *সকিনার বিলাপ*। (Karim and Sharif, 1960: 132) হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দুটিতে ব্যবহৃত কাগজ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত। দশ ফোলিওর প্রথম পাণ্ডুলিপির প্রতিটি ফোলিওর উভয় দিকেই আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা ভাষায় কারবালার ময়দানে সকিনার হাহাকারকে তুলে ধরা হয়েছে। কারবালার প্রান্তরেই কাসিমের সাথে সকিনার বিয়ে হয় এবং বিয়ের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কাসিম মৃত্যুবরণ করেন। সংগ্রাহক আব্দুল করিম অনুমান করেছিলেন পাণ্ডুলিপিটি ৫০/৬০ বছরের পুরাতন। তবে তিনি *কাসেমের লড়াই* নামে পাণ্ডুলিপির সাথে বাধাইকৃত আরেকটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপিটিও বর্তমান গবেষণায় আলোচ্য পাণ্ডুলিপির কাহিনি ও কাব্যরীতির সাথে খানিকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবদুল করিম এবং আহমদ শরীফ আরো দুটি পাণ্ডুলিপির পরিচয় উপস্থাপন করেছেন: *কাসেমের লড়াই* বা *চৌতিসা* এবং *সকিনা বিলাপ* (৯০-৯১/২১৭-২১৮) (Karim and Sharif, 1960: 77)। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি (৯০/২১৭) মোহাম্মদ খানের লেখা কারবালার প্রান্তরে হোসেন পুত্র কাসেমের প্রাণত্যাগের চিত্রায়ণ। তারিখটি দেওয়া আছে ১২০৫ মঘী বা ১৮৪৩ সাল। প্রাপ্ত ১৭ টি ফোলিওয়ের মধ্যে প্রথম দুটি ফোলিওর লেখা পাঠযোগ্য নয়। কাব্যটির শুরুর স্তবকগুলি নিম্নরূপ:

শুন গুণিগণ হই শুন এক মন
কহিবাম ছকিনার বিলাপ
মোহর কর্মেত ছিল বিবার দিন যুদ্ধ হইল।
কর্ম্মভোগ না যায় খণ্ডন
পাইআ অমূল্য ধন গুনিলুম নিরঞ্জন
নৈরাশ করিল নিরঞ্জণ

পাণ্ডুলিপিটির শেষ লাইনদুটি হলো:

এ বুলিআ ছকিনা রহিলেক প্রভূ ভাবি।
এক [মনে] ভাবে নিরঞ্জন। (Karim and Sharif, 1960: 78)

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি (৯১/২১৮)-এর শিরোনাম *সকিনার চৌতিসা* এবং লেখক অজানা। বিষয়বস্তু প্রথমটির অনুরূপ। শুরুর স্তবকগুলি হলো:

সুজন সুজন বান্দা সুন দিআ মন
ছকিনার চৌতিশা বাণি-কহি বিবরণ
জেই রূপে ছকিনা করন্ত কান্দন
আপনার পতির শোকে ভাবি নিরঞ্জন

পাণ্ডুলিপিটির শেষ দুটি লাইন নিম্নরূপ:

সাদের সরণে নারি হইলুম বিমুক।
শিশুকালে প্রভূ মোরে দিলা বহু দুক।।
সিসের সিন্দুর মোরে হরিয়া করওক।
সব জানে বিন্দিয়া হরিআ করওক।। (Karim and Sharif, 1960: 78)

বর্তমান প্রবন্ধে আবদুল করিমের সংগৃহীত ১২৪ নং পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করা হয়েছে। কিন্তু পাঠোদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরের নাম পেলেও কাব্যের ভণিতা ও সমাপ্তি অংশে রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। অনুলিপিকার সম্ভবত এধরনের রীতিতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কেননা আরবি-ফারসি অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপিতে অক্ষর কাটা বা পরিত্যক্ত অক্ষর সংখ্যা অনেক কম। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, সাহিত্য বিশারদের সংগ্রহের ১২৪নং পাণ্ডুলিপিতে শব্দ বা অক্ষর পরিত্যক্তির চিহ্ন একটিও নেই। এটি স্পষ্ট যে, এই কাব্যের কাহিনি-উৎস হলো কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের একটি।[৩]

পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকার (colophon) তথ্য অনুযায়ী 'ওয়াজউদ্দিন পীছরে আফতাবউদ্দিন' এটির অনুলিপি করেছিলেন। লিপিকরের তথ্য আছে তার 'সাকিন নোয়াপাড়া' (ফোলিও ১০, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)। বাংলাদেশের ফরিদপুর, যশোর, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় 'নোয়াপাড়া' নামে পাড়া, গ্রাম অথবা এলাকা রয়েছে। এমতাবস্থায় পাণ্ডুলিপিটি কোন স্থানে বসে লেখা হয়েছে অথবা লেখকের সাকিন (বাসস্থান) নোয়াপাড়া বর্তমানে কোথায় অবস্থিত? এর সুনিশ্চিত জবাব দেয়া কষ্টকর । চট্টগ্রাম বা পার্শ্ববর্তী কোনো নোয়াপাড়ায় এটি কপি করা হয়েছে— এ প্রস্তাবনা যৌক্তিক মনে হয়েছে। কেননা সাহিত্যবিশারদের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম ও তৎসলগ্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিটির লিপিকারের সাকিন বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাইয়ের নোয়াপাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

(২)

সকিনা-বিলাপ: কাহিনি সংক্ষেপ

সকিনা-বিলাপ কাব্যে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হাসানের পুত্র কাসিম ও ইমাম হোসেন জায়া সকিনার বিবাহোত্তর নিরালায় নিবাসের পূর্বে 'পতি' কাসিমের যুদ্ধযাত্রা ও শোকের দৃশ্য ছন্দাকারে তুলে ধরা হয়েছে। ভণিতায় কবি লিখেছেন,

শোনো গুণীগণ হয়ে শোনো এক মন
কহিবাম সকিনার বিলাপ॥
মহর কর্মেতে ছিল বিবার দিনে যুদ্ধ হইল
কর্ম ভোগ না যায় খণ্ডন।
পাইয়া অমূল্য ধন না গুনিলুম নিজ মন
নিরাশ করিল নিরঞ্জন॥ (ফোলিও ১, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)

কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা বাজে; শত্রু-নিনাদে প্রকম্পিত ময়দান। ফোরাত নদী শত্রুর কব্জায়। তৃষ্ণার্তদের আহাজারিতে কারবালার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে। হযরত আলি (রা:)-এর পরিবারের অনেক সদস্য বীর বেশে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন। নবি মুহম্মদ (স:)-এর বংশের প্রদীপ কাসিম রণসাজে এগিয়ে এলেন। পিতৃব্য হোসেন (রা:)-এর সম্মান রক্ষায় রণাঙ্গণে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও হযরত হোসেন স্বীয় অগ্রজ হাসানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে কাসিম ও সকিনার বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। একদিকে রণভেরি অনবরত ভীষণ শব্দ তুলে যুদ্ধের ভয়াবহতা জানান দিচ্ছে আরেকদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় চলছে বিবাহের আয়োজন। হর্ষ ও বিষাদের মিশ্রণে সকল আয়োজন সম্পন্ন হলো। নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর একান্তে মধুর মিলন কিংবা বাসরসজ্জায় নিরালায় কিছু সময় যাপনের সুযোগ কোথায়? এবার যুদ্ধে যাওয়ার পালা। বিবাহের বস্ত্রে বীর বেশে কাসেম অশ্বে আরোহণ করলেন। কিন্তু নববধূ সকিনার হৃদয়রাজ্যে প্রাণনাথকে নির্জনে দেখবার বাসনা। তার অন্তরের অন্দরে পতি বিচ্ছেদের বেদনার ঢেউ।

নববধূ সকিনা বিনয়াবনত চিত্তে প্রাণপতি কাসিমের কাছে মিনতি করলেন, যদি যেতেই হয় যুদ্ধে তবে সঙ্গে করে অভাগীনীকেও নিয়ে চলো। স্বামী উত্তরে বলেন- রণাঙ্গণ প্রস্তুত আমাকে বিদায় করো। যদি যুদ্ধে প্রাণ থাকে তবে ফিরে তোমার দেখা পাবো আর যদি রণাঙ্গণে জীবন চলে যায় তবে স্বর্গে হবে মধুর মিলন। কবির ভাষায়,

> কর জুড়ে করি নিবেদন যদি যুদ্ধে রহে পরাণ
> আসিমু তোমার স্থান তোমার সঙ্গে হইবু দুরুশন
> যদি আমি পরি রণে দেখা নাহি তোমার সনে
> আর দেখা হইবো স্বর্গস্থান। (ফোলিও ১, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)

নববধূ সকিনার মন মানে না। অস্থির হয়ে তিনি নিজের ভাই আলি আকবরের শরণাপন্ন হয়ে অনুনয় করে বলেন: "আলী আকবর ভাই, সত্য করে বলো, পরাণপতির কী উপায় হবে বলো।" (ফোলিও ৩, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪) আলি আকবর ভালো মন্দ উত্তর না দিয়ে নিরব থাকেন। ভাইয়ের নির্লিপ্ততায় "মা মা" চিৎকারে ক্রন্দনে ফেটে পড়েন সকিনা বিবি এবং অনবরত বলতে থাকেন এ যন্ত্রণা কী করে সইবো আমি? এর চেয়ে বরং আগুনের মাঝে ঝাঁপ দেবো; নিজ তনু সংহার করবো অথবা গরল গ্রহণে নিজেকে বিনাশ করে দেবো। নানারকম বিলাপ তুলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার চতুর্দিকে সখীরা বসে বাতাস করতে থাকে। নববধূর বিলাপে শোকাবহ পরিবেশে আরো শোকের ছায়া নেমে আসে।

ক্রন্দনরত সকিনার শিওরে আসেন কাসিম। স্বামী কাসিমকে কাছে পেয়ে সকিনা যেন জীবন ফিরে পেলো। প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর মুখ দেখে তার হৃদয় প্রশান্ত হলো। অমূল্য ধন পেয়ে তার তৃষ্ণার্ত মন তুষ্ট হয় । আকাশের চাঁদ এখন তার হাতে। প্রিয় স্বামীর কাছে বারবার মিনতি করে বলেন, অভাগীনীরে নিরাশ করো না গো প্রাণপতি। আমার মনকে শান্ত করো গো আমার অধিপতি। (ফোলিও ৪, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪) স্ত্রীর মিনতিতে মহাবীর কাসিম কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। যুদ্ধের দামামা বেজেই চলছে; সেখানে আজ বিলাপের সময় নেই। বীরত্বের সাথে লড়াই করে ফোরাতের তীরে শত্রুর দম্ভকে চূর্ণ করার সময় এখন। কাসিম সকিনাকে জড়িয়ে ধরে এবং হাতে চুমো দিয়ে বলেন, আমি যুদ্ধে চললাম। সকিনার অশ্রুতে কাসিমের শরীর ভিজে যায়। কাসিম যুদ্ধে চললেন। পেছন থেকে সকিনা কাতর স্বরে আহ্বান করেন, প্রিয় ধীরে ধীরে চলো। শোনো আমার বচন, তোমার হলে মরণ একা আমি কী করে বাঁচবো? আমার এই দুখের নাই তো নিবারণ। (ফোলিও ৪, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)

উত্তরে কাসিম বলেন, আমাকে নিষেধ করো না; তোমার সাথে দেখা হবে কিয়ামতের ময়দানে। এটাই সত্য। কিন্তু সকিনার মন মানে না। বিবাহসজ্জা বিসর্জন দিয়ে কাসিম যেন অন্যায় করেছেন। কবির ভাষায়,

মুর মনে না পুড়িল আশ
তুমি মোরে বিবাহ কইল্লা।
এক রাত্রি না বাঁচিলা।
পতি হইয়া করিলা অইন্যায় (ফোলিও ৫, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

সকিনার অনুনয় বিনয় শুনে কাসিম বলেন, প্রিয়া আমার আবেদন শোনো। যদি তোমার কথা শুনে যুদ্ধে না যাই তবে পিতা-ভ্রাতার কাছে আমি কী উত্তর দেবো? ইতোমধ্যে শত্রু পক্ষের সিপাহিদের চিৎকার ভেসে এলো। কে আছো আসো যুদ্ধের ময়দানে? সে ডাক কাসিমের ধমনী আন্দোলিত করে। কাসিম ঘোড়া হাকিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ছুটলেন। সকিনা তখন বলে উঠলেন, যদি যাও তবে অভাগিনীরে একবার দেখে যাও আঁখি ভরে। হৃদয়মাঝে তোমায় রাখবো গেথে যেন শত্রু তোমাকে স্পর্শ করতেও না পারে। চাদর মুড়ি দিয়ে সকিনা কাসেমের ঘোড়ার পিছু চলতে চলতে বলেন,

সঙ্গে করে নিও দাসি।
সেবিমু চরণ পুনি, আমি নারী জনম দুঃখিনী
হা হা মোর পরাণ পতি, হযরত আলির নাতি
কোন দোষে ছাড়িলা আমারে (ফোলিও ৭, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

সকিনার শোকার্ত বিলাপ ইথারে ইথারে ভেসে চলে কারবালার প্রান্তরে। কারবালার বাতাসে মিশে যায় পতি বিচ্ছেদের করুণ আকুতি। প্রিয়ের পথপানে আকুল নয়নে চেয়ে থাকে সকিনা। কাসিমের অশ্বধ্বনি ধীরে ধীরে মিলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। সকিনার বিলাপ ধ্বনি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধূলায় লুটিয়ে পড়ে দেহখানি তার। ভেঙে যায় সকিনার পায়ের নূপুর; অঙ্গসজ্জাহীন হয়ে ধূলায় লুটিয়ে এলোকেশে কন্যা পিতা-ভ্রাতার কাছে অনুযোগ তোলেন,

আমি নারী হইলাম নইরাশ
কহো মুর বাপ ভাই
বিবা দিলা কার ঠায়
কার হস্তে কইল্লা সমর্পণ (ফোলিও ৭, গৌণ পৃষ্ঠা; ফোলিও ৮, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

সকিনার ক্রন্দনরোলে পাষাণ হৃদয়ও যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার কান্নায় বনের পশুপাখিও শোকে কাতর হয়ে পড়ে। সকিনার হৃদয়াকাশে আশা-ভরসার যে নতুন সূর্য উদয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল নিমিশে তা অস্তমিত হয়ে যায়। হোসেনের অনুসারীদের শিবিরে দিবানিশি শোকের মাতম চলছে। সকিনার বিলাপে সেই শোক তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে গোটা দুনিয়া অন্ধকার করে তোলে। কারবালার আকাশে কালো মেঘের ঘনছায়া নিকষ কালো হয়ে ঘনীভূত হয়ে যায়। তাঁবুতে তাঁবুতে চলছিল স্বামী, পুত্র এবং ভ্রাতা হারানোর মাতম। পিপাসার্ত নারী-শিশুর আর্তনাদ আর কান্নার রোল সাত আসমান ভেদ করে চলে যায় উর্ধ্বলোকে। স্বর্গলোকেও আজ যেন নেমে এসেছে নিকষ কালো বিষাদের ছায়া ।

রণাঙ্গণ থেকে সংবাদ এলো কাসেম বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছেন। এজিদের পাপিষ্ঠ বাহিনী নবি বংশের প্রদীপ কাসিমকে হত্যা করে বীভৎস চিৎকারে উল্লাস করেছে। কাসিমের নিথর দেহ তার প্রিয় মায়ের কোলে আনা হলে পুত্রের মৃতদেহ দেখে মায়ের হৃদয় চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়ে। বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে হৃদয়রাজ্য অনবরত বজ্রাঘাতে জর্জরিত হয়। হোসেনের শিবিরে কান্নার রোল পড়ে

যায়। হযরত আলি (রা:) এর পরিবারের রমণীরা পুত্র শোকে বিলাপ শুরু করে। শোকাতুর জননী মৃত পুত্রের মাথা কোলে নিয়ে একসময় তা তুলে দেন নববধূর কোলে। প্রাণপতির রক্তাক্ত শির দেখে সকিনা কেঁদে কেঁদে বললেন, "হা হা মোর পরাণ পতি। কেনে হইল হেন গতি। কোন পাপে করিল নিদান।" সকিনা স্বামীর দেহে লুটিয়ে পড়ে চেতনা হারালেন। শোকবিহ্বল সকিনার চেতনা ফিরে এলে বলেন,

যদি নিতা সঙ্গে করি পক্কি রূপ ছায়া ধরি
আমি নারী করিতুম বাতাস (ফোলিও ৯, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

স্বামীহারা সকিনার এখন কী উপায় হবে? প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে তার জীবন বিপন্ন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ তার জন্য বিষাদে পরিণত হয়েছে। শোকসাগরে ভাসিয়ে তার প্রাণনাথ চলে গেছে অজানা দেশে। সকিনা সিদ্ধান্ত নেন তিনি যোগিনী বেশে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেবেন। তিনি রোম-শামসহ নানা দেশে ঘুরে বেড়াবেন। 'পরাণপতি'র কথা মনে করে পাহাড়-পর্বত আর জঙ্গল সন্ন্যাসী রূপে হাহাকর করে তার বাকি জীবন কাটবে। কবিতার ভাষায়,

প্রতি দেশে করিমু বিচার।
ধরিয়া যোগিনী বেশ   উড়মি চাহি নানান দেশ
রোম শাম করিমু বিচার॥
সন্যাসির ধরি বেশ   যাবত জীবন শেষে
পরাণ পতি করিমু স্মরণ।
নাতু দুই শোকে লইয়া   পাহাড়ে চড়িমু গিয়া।
হাটে ঘাটে করিমু বিচার॥ (ফোলিও ১০, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

কবি শেরবাজ খান নববধূর পতি বিয়োগের শোক আর বৈরাগ্য গ্রহণের হাহাকার জানিয়ে কবি *সকিনা-বিলাপ* কাব্যটির ইতি টানেন। ইরাকের ফোরাতের তীরের কষ্টপাওয়া কন্যার আত্মা শান্তির প্রত্যাশা করেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা দেশের। বৈরাগীর আত্মা হাহাকার করে কারবালার অন্যায়ের প্রতিকার চায় বাংলার 'হাটে-ঘাটে'। কবির শব্দজালে কারবালার প্রান্তরের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বেদনা স্ফুরিত হয় বাংলার স্থানিক পাটাতনে।

(৩)

আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লিখন-রীতি

বাংলা ভাষায় পাণ্ডুলিপি অনুলিপির কোন পর্যায়ে এবং কী প্রেক্ষাপটে আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লিখন রীতি শুরু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাংলা ভাষার এবং লিপির বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় বিষয়টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেন এই ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল? কোন স্থানিক পরিমণ্ডলে এবং কোন জনগোষ্ঠীর জন্য এই রীতিতে পুথি অনুলিপি করা হলো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পণ্ডিতগণ নানাভাবে দিয়েছেন। এস এম লুৎফর রহমান মনে করেন, মুসলিম আমলের শেষদিকে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন বাড়তে থাকে। কালক্রমে এই প্রবণতা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন, শুদ্ধতাবাদী ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমানরাই কেবল আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন (লুৎফর, ২০০৫: ২০৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদির সঙ্গে সঙ্গে গল্প-কল্প-কাব্যও লেখা

হয়েছে। পুথি রচনা নয় বরং পুথি অনুলিপির ক্ষেত্রেও আমরা এই লেখরীতির ব্যবহার দেখেছি। এর সমর্থন পাওয়া যায় লুৎফর রহমানের বক্তব্যে:

> বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায়- আরবী হরফে বাঙালা ভাষায় কেবল ধর্মীয় কেতাবাদি লেখা হয়নি, সেই সঙ্গে গল্প-কল্পকাহিনীমূলক কাব্যও লেখা হ'য়েছে। এ রীতিতে কেবল ছোট ছোট পুথি নয়, 'আমীর হামজা'র মত বড় বড় কেতাবও লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে- আলাওলের 'পদ্মাবতী'র মত সংস্কৃত- প্রধান বাঙালায় লেখা কাব্যও। (লুৎফর, ২০০৫: ২০৯)

বিগত শতকের ত্রিশের দশকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Develepemnt of the Bengali Language* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছ থেকে আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলায় লেখা কিছু পাণ্ডুলিপির নমুনা পেয়েছিলেন। এগুলিকে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ভাষার ধ্বনিবিদ্যার ইতিহাসের জন্য মূল্যবান আকর সূত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যেও এধরনের নমুনা (৮৭, ৯৯, ১২৪ এবং ২৭৮) তিনি দেখেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবনা হলো ত্রয়োদশ শতকে (হয়ত এর আগেই) চট্টগ্রামবাসী মুসলিমরা বাংলা লিখতে আরবি-ফারসি হরফ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলার অন্যান্য জায়গার মুসলিমরা বাংলা অক্ষরেই বাংলা পুথি লিখতেন। এই রীতির পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষা উত্তম বাংলা এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ শব্দ ও প্রত্যয় সম্বলিত। এগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ লেখা হয়েছে ধ্বনিকে অনুসরণ করে। এছাড়া আরবি-ফারসি শব্দগুলি আদিরূপেই উপস্থাপিত। এই পুরোধা ভাষাবিদ তাঁর গ্রন্থে বাংলা ও সংস্কৃত অক্ষরগুলির আরবি-ফারসি হরফে প্রতিবর্ণীকরণের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন (Chatterji, 1929: 229-231)।

মুহম্মদ এনামুল হক এ ধরনের পুথি রীতিকে উনিশ শতকীয় প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত কবি জান মুহম্মদের *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ছয়টি অনুলিপির মধ্যে দুটি ছিল আরবি হরফে লিখিত। ১৮৫২ সালে রচিত *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ভণিতা অংশে কবি লিখেছিলেন:

> আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
> আরবী অঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন।।

এই পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি এই গবেষক কবি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যের একটি আরবি হরফে অনুলিপি পুথিকে ব্যবহৃত কাগজ ও লিপিবিদ্যার নিরিখে উনিশ শতকীয় হিসেবে শনাক্ত করেন। তাঁর মন্তব্য হলো: "ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলিম কবি ধর্ম-বিষয়ে বাংলা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়।" (হক, ২০০১: ৩৫) কিন্তু বর্তমান গবেষণায় এই প্রস্তাবনাটি গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। কেননা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের এ রীতির একাধিক পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় রয়েছে।

বাংলা লিপি বিশারদ এস এম লুৎফর রহমান সুনীতিকুমারের প্রস্তাবনা অনুসরণ করে প্রায় একই রকমের মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, মোগল আমলে এসে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে এই শব্দগুলি আরবি বর্ণমালায় লেখা সহজ ছিল। এই পদ্ধতি অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্যকর্মগুলি অনুলিপিতে *কাতেবগণ* (মুসলিম ও হিন্দু) সহজেই শত শত পৃষ্ঠা আরবি হরফে বাংলায় ভাষা অনুলিপি

করতে অভ্যস্ত ছিলেন। লুৎফর রহমানের প্রস্তাবনায় আরেকটি সংযোজন ছিল বর্ণমালার অনুরাগের পাশাপাশি মধ্যযুগের উচ্চাবচ সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস। রহমানের ভাষায়,

> লিপি-প্রেম, ভাষা- অনুরাগ, প্রেম-প্রীতী ... চিরকাল .. ছিল না। লিপি-প্রেম, ভাষা-প্রেম, দেশ-প্রেম, ধর্ম-প্রেম ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীগত প্রেম-প্রণয়ের চেহারাও ছিল এক এক সময় এক এক রকম। মুসলিম আমলের পাঁচ শ' বছর যাবৎ দেশীয় জনগণ সম্পর্কে উচ্চশ্রেণীর এক বিশেষ অংশের ঘৃণা-বিদ্বেশ ছিল অকল্পনীয়। এক্ষেত্রে মুসলমান উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা, হিন্দু উচ্চশ্রেণীর মনোভাব-ই ছিল অধিক ক্ষতিকর ও নিন্দনীয়। ....বাঙালা লিপির প্রতি মুসলিম কবি-লেখকদের আগ্রহ, মুসলিম শাসকদের ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতা- এক শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এত ক্ষুব্ধ করে যে, তাঁরা এমন প্রবাদ চালু করেন, যা শুনে হিন্দু মাত্রই শিউরে উঠতে বাধ্য। কারণ তা, অমান্য করা ঘোরতর পাপ। ....বাঙালা লিপির প্রতি 'আর্য ব্রাহ্মণ' পণ্ডিতদের এই চির-বিদ্বেষ দূর করে, বাঙালায় একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বসম্মত লিপি প্রচলনের জন্যই ষোল-সতের শতকের মুসলমান কবি-লেখকগণ- আরবী হরফে বাঙালা লেখার উদ্যোগ নেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, উত্তর ভারতে আরবী লিপি তথা উরদু লিপি বিনা বাধায় মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি তা বাঙলাদেশেও হতে পারবে। (লুৎফর, ২০০৫: ২৪৭-২৪৮)

এই গবেষকের মতে, বাংলা লিপি বর্জনের আরেকটি কারণ হলো এর তান্ত্রিক সংযোগ। এই বিষয়টি বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বাঙালি মুসলমানদেরও জানা ছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায় এ-লিপিকে অবৈদিক ও অনৈসলামিক লিপি বলে পছন্দ করতে পারেন নি। (লুৎফর, ২০০৫: ২৪৮)

বর্তমান গবেষক এই প্রস্তাবনার সাথে দ্বিমত করছেন। কেননা সমকালীন আকরসূত্রগুলিতে এই ধরনের পছন্দ অপছন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। লুৎফর রহমানের রচনায় উত্তর ভারতে উর্দু লিপির বহুল প্রচলন অথবা বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের কারণে এধরনের লিপিরীতি উদ্ভবের স্বপক্ষে প্রামাণিক দলিল অনুপস্থিত। সম্প্রতি কবি শেরবাজের রচিত ফাতেমার *সুরতনামা* কাব্যগ্রন্থটির পাঠ ও সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে (হাসান, ২০২০)। আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত এই কাব্যটির একাধিক পুথি পাওয়া যায়। কবির কালনির্ণয় এবং পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকার তথ্যাদি এই রীতির কাল নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। দুঃখের বিষয়, কবি ভণিতায় নিজের নাম ছাড়া তেমন আর কোন তথ্য প্রদান করেননি। সমসাময়িক কাব্য ও সেগুলির রচনাকাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পণ্ডিতগণ এই কবির সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং এনামুল হকের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। সাহিত্যবিশারদ *ফাতেমার সুরতনামা*-এর কবি হিসেবে শেরতনুর নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এই সাহিত্যিক ষোড়শ শতাব্দীর কবি। (Karim and Sharif, 1960: Appendix vi-vii) তবে তিনি শেরবাজ চৌধুরি নামে আরেকজন কবির নাম উল্লেখ করেন যিনি *কাসেমের লড়াই* এবং *মল্লিকার সাওয়াল* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি এই কবির সময় চিহ্নিত করেন অষ্টাদশ শতাব্দী (Karim and Sharif, 1962: Appendix vii)। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাঁচটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩০২, ৩০৩ ও ৩০৪ নং পাণ্ডুলিপিতে কবির নাম শেখ তনু এবং ৩৬৩ নং পাণ্ডুলিপির ভণিতার নিম্নোক্ত শ্লোকে কবির নাম উল্লেখ আছে শেরবাজ:

> হীন শেরবাজে কহে সবার চরণ।
> ফাতেমার সুরতের কথা শোন সবাগন। (ফোলিও ১, মুখ্য দিক, পুথি নং ৩৬৩)

এনামুল হক কবি শেরবাজকে ত্রিপুরার কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন (হক, ২০১৩: ১৬৪)। এই লেখকের কাব্যগ্রন্থ তিনটি: *ফাতেমার সুরতনামা*, *কাসেমের লড়াই* এবং *মল্লিকার সাওয়াল*।

সমসাময়িক আরেক কবি শৈখ সাদী *গদা মল্লিকা* কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু হল রুম-রাজনন্দিনী মল্লিকার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। মল্লিকা শপথ করেছিলেন যে, তাঁর হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। আবদুল্লাহ ওরফে গদা সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মল্লিকাকে বিয়ে করেন। কাব্যটির রচনাকাল পাওয়া যায় ১১২২ ত্রিপুরা অব্দ/১৭১২ সাল। শৈখ সাদী এবং কবি শেরবাজ-এর মধ্যে দ্বিতীয়জনই পূর্ববর্তী সময়ের। দুইজন কবিই মূলত ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর *ফক্কর-নামা* কাব্যের হুবহু অনুকরণ করে বাংলা ভাষায় কাব্যাকারে কাহিনিটি উপস্থাপন করেন। শেরবাজের কাব্য পড়েই শৈখ সাদী তার কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এই বিবেচনায় শেরবাজ ১৭১২ সালের আগের কবি (হক, ২০১৩: ১৬৪)।

আবদুল করিম কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা* কাব্যগ্রন্থটির পাঠ ও সম্পাদনা করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি (নং ২৫৪) দেশি কাগজে ও কালিতে আরবি নাসখ অক্ষরে লিখিত (করিম, ১৩৮১) । পাণ্ডুলিপিটির লিপিকর বাকের আলীর পুত্র জানে আলী পোমরা গ্রামের বাসিন্দা। পোমরা গ্রাম বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার ৬নং ইউনিয়নের একটি গ্রাম। লিপিকর বাংলা অক্ষরে লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কপি দেখে আরবি অক্ষরের পাণ্ডুলিপিটি নকল করেছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভণিতাংশে:

> কন হরফে কন লফজ ন বুঝি এ অর্থ
> বাংলা অক্ষর হেরি আরবীয় পুস্তক।[৪]

বর্তমান গবেষণায় পাঠোদ্ধারকৃত *সকিনা-বিলাপ* এর অনুলিপিগুলির লিপি-বৈশিষ্ট্যের আলোকে কাল নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। পাণ্ডুলিপির বাংলা অক্ষর এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষজ্ঞরা একে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দী কালপর্বে লিখিত হিসেবে মত প্রকাশ করেন।[৫]

সম্প্রতি থিবো দ্যুবে এই লেখরীতির নানা দিক তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতিতে *আমীর হামজা*, *নবীবংশ*, *জঙ্গনামার* মত পুথি ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র কাহিনি বা কাঠামোর পুথি অনুলিপি করা হয়েছে। তিনি এটিকে 'বিস্মৃত অধ্যায়' হিসেবে আখ্যা দিলেও পাঠকের সামনে এর দেশজ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন (দ্যুবে, ২০২০)। বর্তমান গবেষকের মতো তিনিও এই রীতিতে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ বা ডাটাবেইজ এর অনুপস্থিতি, এবিষয়ক গবেষণার একটি বড় সীমাবদ্ধতা মনে করেন। তাঁর মতে, "আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরবি হরফে লিখিত বেশিরভাগ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল চট্টগ্রাম এবং আরাকান আঞ্চলে যা আজকের মিয়ানমারের অংশ।" (দ্যুবে, ২০২০) তবে এই রীতির প্রারম্ভিক পর্ব ছিল সপ্তদশ শতক। এই রীতি প্রচলনের কারণ হিসেবে 'স্থানীয় সাহিত্যের ইসলামিকরণ' বলা হলেও থিবো এরকম দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে বাংলা লিপির ইতিহাস ও পুথি লেখার পদ্ধতিগত বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করছেন। রিচার্ড সলোমনের *Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the other Indo-Aryan Language* গ্রন্থের আলোকে থিবো প্রস্তাবনা হলো: পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা ও দক্ষিণ পূর্বের স্থানীয় ভাষাসহ সংস্কৃত পুথির অনুলিপিতে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল সিদ্ধমাতৃকা অক্ষর থেকে। বাংলা ভারতীয় অক্ষররীতির পাশাপাশি 'সংস্কৃত লেখ্যরীতির বৃহত্তর পরিসরের উত্তরাধিকারী' হয়ে উঠেছিল। (দ্যুবে, ২০২০) তাহলে কেন স্থানীয় বর্ণমালার পরিবর্তে বিদেশি আরবি বর্ণমালায় বাংলা লেখা হলো? এই প্রশ্নের উত্তরে থিবো বলেন, এই কালপর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। শাসকবর্গ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এটি করতে পারেন। এছাড়া আরবি অক্ষরে লেখ

রীতি সংস্কৃতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক। আরবি অক্ষরের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সক্ষমতা, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, কিংবা ব্যাকরণের নিয়মাবলি ইত্যাদি কারণে আরবি অক্ষর লিপিকারদের পছন্দ। এই পাণ্ডুলিপিগুলির প্রায়োগিক দিক ছিল; এগুলি ছিল পারফরমেন্সের অংশ। পাঠক উচ্চস্বরে পড়তেন এবং শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। স্বরধ্বনির উঠা-নামা, দীর্ঘ কিংবা হ্রাসকৃতরূপের মাপকাঠি আরবি লেখ্যরীতিতে বিদ্যমান; যা বাংলা বা ভারতীয় লেখরীতিতে নেই। অনুলিপিকার কিংবা রচয়িতারা এ বিষয়টিকেও বিবেচনা করতেন। উল্লেখ্য যে, আরবি বর্ণমালায় কিছু ধ্বনির বহিঃপ্রকাশ নেই। বাংলায় 'প' কিংবা 'চ' বর্ণে ধ্বনিরূপ বা প্রতিবর্ণিকরণ আরবি বর্ণমালায় দেখা যায় না। এর উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ফারসি বর্ণমালাকে যুগলবন্দি করে আরবি-ফারসি উভয় বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে। (দ্যুবে, ২০২০) থিবুর ব্যাখ্যা অত্যন্ত যৌক্তিক হলেও প্রশ্ন রয়েই যায় যে, লেখরীতির কত শতাংশ ফারসি? কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ফারসি লিপি ব্যবহার বহুল? আরবি ব্যাকরণের প্রাধান্য মেনে নিলেও ফারসি বর্ণমালার পাশাপাশি কতটুকু ফারসি ব্যাকরণ নেওয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। থিবোর সাম্প্রতিক প্রকাশনা *Meaningful Rituals: Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal* গ্রন্থে *নুরনামা* কাব্যের তিনটি পাণ্ডুলিপির পাঠ ও সম্পাদিত ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি মধ্য এশিয়ার বোখারাতে অনুলিপিকৃত একটি ফারসি পাণ্ডুলিপি। দ্বিতীয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিমের (১৬৬০ সাল) রচনা। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রামেরই আরেক জন কবি মোহাম্মদ শফির লেখা *নুরনামা* কাব্যের আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত। এই পাণ্ডুলিপিতে তারিখ উল্লেখ নেই। ব্যবহৃত কাগজের নমুনা দেখে এটিকে আঠারো-উনিশ শতকের পুথি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (d'Hubert, 2022)। এই গ্রন্থে থিবোর পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাগুলির দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হলেও বর্তমান গবেষক উপস্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আরবি-ফারসি বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত কয়েকটি বাংলা পুথির উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য এবং এতদসংক্রান্ত কিছু প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) কবি সৈয়দ হামজা রচিত *আমির হামজা*-এর একটি অনুলিপিতে (সা. বি. ১০) প্রথম দুই ফোলিওর পর থেকে পৃথক রীতিতে আরবি হরফে লেখা। প্রথম দুটিতে *নাসখ* রীতি লক্ষ করা গেলেও পরের অংশগুলিতে *নাসতালিক* রীতি দেখা যায়। একই পাণ্ডুলিপিতে একাধিক রকমের লিপিরীতি বাংলা কিংবা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও দেখা যায়। সম্ভবত প্রথম দুই ফোলিওর অনুলিপিকার আর কাজটি করেন নি। এ কারণে নতুন কেউ পরবর্তী অংশগুলি লিখেন। কিন্তু কোন কারণে এটি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের সুযোগ একেবারেই নেই।

(খ) সৈয়দ সুলতানের *ইবলিশ নামার* একটি পাণ্ডুলিপিতে (সা. বি. ৩৬) শেষের তিনটি ফোলিওতে দেখা যায় বাংলা অক্ষরে মূল লেখার পাশে অংকে ১, ২, ৩ এভাবে ১২ পর্যন্ত লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষরের পার্শ্ববর্তী লাইনে বাংলায় 'পরথমে', 'দ্বিতীয়ে', 'তৃতীয়ে' এইভাবে 'দ্বাদশে' পর্যন্ত লেখা আছে। সম্ভবত একাকী পুথি পাঠ এবং জনপরিসরে পুথি উপস্থাপন বা পারফরমেন্সের সময় বিষয়গুলি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচরে আনার জন্যই পাশে অংকে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পুথির অনুলিপিকারের পাশাপাশি পাঠকও বাংলা ও আরবি উভয় লিপির সাথে পরিচিত– এই প্রস্তাবনার সমর্থন পুথিটির এই তিন ফোলিওতে মেলে।

(গ) কবি সৈয়দ সুলতানের রচিত *ওফাতে রসূল* কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপি (সা. বি. ৪৮)—এর প্রতি ফোলিওতে প্রতিটি লাইনের শুরু এবং শেষে ক্ষুদ্রকার চার বা ছয় পাপড়ি সম্বলিত চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অংকিত চিহ্নগুলি পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত লেখার ক্ষেত্রে দেওয়া বিরতি বা সমাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতিটি আয়াতের শেষে যেমন সমাপ্তি চিহ্ন তেমনি এই পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইনের

শেষেও রয়েছে সমাপ্তি চিহ্ন। এটি পাণ্ডুলিপির উপস্থাপনগত সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাপ্তি প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতিফলন।

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত *জ্ঞান-সাগর* পুথির একটি পাণ্ডুলিপি (সা. বি. ১৪৬)—এর কয়েকটি ফোলিওতে ডান দিকের খালি জায়গায় আড়াআড়িভাবে বাংলা অক্ষরে মালিকের নাম লেখা: "*এই পুস্তকের মালিক শ্রীআবদুলকাদেরফজরআলীসাংহুসাইন থানাপটিয়াজিলাচট্টগ্রাম*"। পুথির ভাষ্য এবং মালিকের নাম একই কালিতে লেখা। সাকিন উল্লেখ করতে গিয়ে 'থানা' ও 'জিলা' শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে পুথিটির মালিক উনিশ শতকে শেষ পর্বে জীবিত ছিলেন।

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি হরফে পুথি সংক্রান্ত উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের সকল পুথি সংগ্রহশালায় জরিপ করে একটি ক্যাটালগ প্রস্তুত করা। কেননা বর্তমান গবেষকের কাছে এটি স্পষ্ট দোভাষী পুথি, হাতে লেখা বাংলা, সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি পুথিবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত। পক্ষান্তরে আরবি-ফারসি হরফে লেখা বাংলা পুথির গবেষণাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ের। এই রীতিতে অনুলিপিকৃত কেনো পুথিকে ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক কালপর্বে রচিত বলে শনাক্ত করা যায়নি। ১৫৬৫ সালে রাজমহলের যুদ্ধে জয়ের পর বাংলার উত্তর-পশ্চিম এলাকায় মোগল বাদশাহদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বাংশসহ সমগ্র বাংলা মোগলদের নিয়ন্ত্রণে আসে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। এই বিবেচনায় মোগল যুগে বাংলায় এই রীতিতে পুথি অনুলিপি শুরু হয়েছিল—থিবোর এই প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য। বাংলা ভাষায় আরবি, তুর্কি, ফারসি ও উর্দু শব্দের বহুল ব্যবহারের কারণে লেখনীর সুবিধার্থে এই রসম চালু হয়েছিল সুনীতিকুমারের এই উপসংহারের সাথে বর্তমান গবেষক বিনয়ের সাথে দ্বিমত করছেন। সম্ভবতঃ মধ্যপর্বের বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য এই পদ্ধতিতে পুথি অনুলিপির কাজকে সহজ করেছিল। বিষয়ের বৈচিত্র্য বিচারে এই রীতির পুথিগুলিকে শাস্ত্রকথা বা ধর্মবচন হিসেবে চিহ্নিত করা বিভ্রান্তিমূলক। আরবি ব্যাকরণের কাঠামো ও আরবি লিখন পদ্ধতি এই রীতিতে পুথি অনুলিপি প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় করেছিল। বাংলার প্রধান দুটি ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী— হিন্দু এবং মুসলিম—জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রবণতা মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে লক্ষ করা যায় এই লিপি রীতি হয়তো তারই একটি দৃষ্টান্ত। স্থানীয় যৌগিক অ-মুসলিম সমাজ- হিন্দু-নাথ- বৈষ্ণব-সমাজের সাথে মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সমঝোতা এবং আদান-প্রদান ধর্মীয় বাতাবায়ন মেনেই সংগঠিত হয়েছিল? বিষয়টি সকলের পারস্পরিক গতায়তের প্রমাণ? বাংলা হরফে আরবি পুথি অনুলিপিকরগণ সচেতনতার সাথেই এধরনের প্রকল্পে সংযুক্ত হয়েছিলেন? উত্তর ভারতীয় মোঘল শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম ও ধর্ম ভাবনা বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকার অনুলিপিকারদের বিবেচনায় ছিল?—এসকল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তরের জন্য প্রয়োজন ভাষাবিদ, লিপিবিদ এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক বহু-শাস্ত্রীয় (multi-disciplinary) অনুসন্ধান।

টীকা

[১] বর্তমান প্রবন্ধটি ২০২৩ সালে উপস্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলা অনুষদ বক্তৃতামালা ১২'-এর পরিমার্জিত রূপ। আমি বাংলা হরফে আরবি পুথি বিষয়ক গবেষণার শুরু করি ২০১৭ সালে এবং তা চলমান। এবিষয়ক প্রকাশণা ও প্রস্তাবনা সমুহের জন্য দেখুন, শহিদুল হাসান, (২০২০) *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; '*ফাতেমার সুরতনামা*: পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ১২ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৮১; 'ফাতেমার সুরতনামা: পাণ্ডুলিপি পাঠ ও বাংলা লিখনরীতি', *ইতিহাস প্রবন্ধমালা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃষ্ঠা ১৭৩-৮৮; (২০২৫) *সকিনা-বিলাপ পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

[২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বর্তমান গবেষককে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে *সকিনা-বিলাপ* পাণ্ডুলিপিটি পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করতে দিয়েছিল। পাণ্ডুলিপি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত গবেষণা কর্মকর্তা শাহীন সুলতানা এবং পাণ্ডুলিপি শাখার সিনিয়র ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট মো. রফিকুল ইসলাম হাওলাদার এর প্রতি কৃতজ্ঞতা। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আবুবকর এবং প্রত্যাশা মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পাণ্ডুলিপি শাখায় তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে সহায়তা করেছে। তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ।

[৩] আমাদের অনুমান মধ্যযুগের বিখ্যাত কাব্য *মকতুল হোসেন*-এর বিষয়কে সামনে রেখে এই কাব্যটি রচিত। *মকতুল হোসেন* বিশাল কাব্যগ্রন্থটির একটি অংশ ছিল 'কাসেমের লড়াই'। যেখানে কারবালার প্রান্তরে নববিবাহিত কাসেমের শাহাদাতের ঘটনাবলি চিত্রায়িত করা হয়েছে।

[৪] আবদুল করিম '৪০ ক' এবং '৬৯ ক'-এর শ্লোক একই রকম পেয়েছিলেন। (আবদুল, ১৩৮১: ১৮২-৮৩)।

[৫] বর্তমান গবেষক *ফাতেমার সুরতনামার* পাণ্ডুলিপিগুলি ড. মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়কে দেখালে তিনি এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদিও অনুলিপিগুলি অষ্টাদশ শতকের কিন্তু এই কাহিনির প্রাচীনতা আরো দুই/তিন শতক আগের। এছাড়া ড. রজত সান্যাল (লিপি বিশারদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ, হেড, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এটিকে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের হিসেবে মত প্রকাশ করেন।

আকর সূত্র

অজ্ঞাত, সকিনা বিলাপ, সা.বি. ১২৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

অজ্ঞাত, সকিনার চৌতিসা, সা.বি. ৯১, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

মুহাম্মদ খান, *কাসেমের লড়াই* বা *সকিনার চৌতিসা*, সা.বি. ৯০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সৈয়দ সুলতান, *ইবলিশ নামা*, সা.বি. ৩৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সৈয়দ সুলতান, *ওফাতে রসূল*, সা.বি. ৪৮, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সৈয়দ হামজা, *আমির হামজা*, সা.বি. ১০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

আলি রাজা, ওরফে কানু ফকির, *জ্ঞান সাগর*, সা.বি. ১৪৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

উল্লেখপঞ্জি

David H Cashin (1995) *The Ocean of Love: Middle Bengali Sufi Literature and the Fakirs of Bengal*, Stockholm: Association of Oriental Studies, Stockholm University.

S. K. Chatterji (1926) *Origin and Development of Bangla Language,* Calcutta: Calcutta University Press.

Thibaut d'Hubert T. (2022) *Meaningful Rituals: Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Taradition of Eastern Bengal,* Delhi: Primus Books.

Ayesh A. Irani (2021) *The Muhammad Avatara: Salvation History, Translation, and the Making of Bengali Islam,* New York: Oxford University Press.

Abdul Karim and Sharif A. (1960) *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection, Dhaka,* Dhaka.

Q. A. Mannan (1974), (2nd rep.) *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.),* Dhaka: Bangla Academy.

A. Roy (1983) *Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* Dhaka: Academic Publisher.

T. K. Stewart (2019) *Witness to Marvels: Sufism and Literary Imagination,* California: University of California Press.

আবদুল করিম (১৩৮১ বঙ্গাব্দ)। 'কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), পাণ্ডুলিপি, ৪র্থ খণ্ডঃ ১৫৩-২০৬

থিবো দ্যুবে (২০২০)। 'দেশি বচনের বিস্মৃত পাঠঃ আরবি হরফে বাংলা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি', *ভাবনগর*, খণ্ড ১২, সংখ্যা, ১৩-১৪: ১৪৪৮-৬২

এস এম লুৎফর রহমান (২০০৫)। *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

এনামুল হক (২০০১)। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ৩য় সংস্করণ

শহিদুল হাসান (২০২০)। *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

(২০২২) '*ফাতেমার সুরতনামা*ঃ পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ১২ জুলাই ২০২১-জুনঃ ১৭৩-১৮১

(২০২৩) 'ফাতেমার সুরতনামাঃ পাণ্ডুলিপি পাঠ ও বাংলা লিখনরীতি', *ইতিহাস প্রবন্ধমালা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফেব্রুয়ারিঃ ১৭৩-৮৮

(২০২৫) *সকিনা-বিলাপ পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনা*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।